অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ‘পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি’ : সমকালে, চিরকালে

অভিজিৎ মাইতি

শ্রীমা সারদা এবং সারদা-প্রসঙ্গ

উনিশ শতকের কলকাতা থেকে অনতিদূর দক্ষিণেশ্বরে বসে একজন দেবমানব, অনাগত কালের জন্য যে মানবজীবন-সম্ভাবনার বিচিত্র বীথিপথ সংরচন করে চলেছিলেন, সেই শ্রীরামকৃষ্ণকে সমকালে দাঁড়িয়ে যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাঁরা এই অলোকসামান্য মানুষটির জীবন ও কথাকে বাণীবদ্ধ করে, অনাগত কালের চিরসম্পদ করে রাখতে উৎসাহী হয়েছিলেন। সেই প্রচেষ্টাতেই শ্রীরামকৃষ্ণের অনুষঙ্গে তাঁর সহধর্মিণী সারদা দেবীও আলোচনার বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করে গিয়েছেন। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের কথা প্রকাশিত হতে শুরু করে। তারপর রামচন্দ্র দত্তের লেখা ‘পরমহংস-দেবের জীবনবৃত্তান্ত’ (১৮৯১), সুরেশচন্দ্র দত্তের লেখা ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ’ (১৮৯৪) প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাথমিক জীবনীগ্রন্থগুলি প্রকাশিত হতে শুরু করে। এইসব রচনায় বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনার প্রেক্ষিতে নিতান্ত সাধারণভাবে, অতি সংক্ষেপে তাঁর সহধর্মিণী সারদা দেবীর কথা লেখা হয়েছে। এই পর্বে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ শিষ্যদের কাছ থেকে মা সারদা সম্বন্ধে রচনা খুব বেশি পাওয়া যায় না, শুধু স্বামী অভেদানন্দ ‘প্রকৃতিং পরমাং...’ মাতৃস্তোত্রটি সংস্কৃতে রচনা করেছিলেন।

প্রথম প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যেক সংসারত্যাগী শিষ্যই যে মা সারদাকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে চিনতে পেরেছিলেন এমনটা নয়, যদিও গুরুমাতা হিসাবে সকলেই তাঁকে গভীর শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। তখনও সময়ের পথপর্যটনে সেই সময় আসেনি যখন মায়ের ভাস্বর জীবনের আলোককণা বিচ্ছুরণে খুলে যাবে সন্তানদের বোধভূমি। শ্রীরামকৃষ্ণই যে সারদা-রূপে জগতে তাঁর পরিকল্পিত কার্যধারা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং সেই কার্যধারা ভিন্ন রূপে-বৈচিত্র্যে-মাধুর্যে-মহিমায় আগামী পৃথিবীতে স্বতন্ত্র দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে—এই দিকে সকলের প্রথম নজর ফিরিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। বহুবিধ দৃষ্টান্তের মধ্যে উল্লেখ্য, ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে স্বামী শিবানন্দকে লেখা স্বামীজীর চিঠির একটি অংশ : ‘‘মা-ঠাকরুণ কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেহই পার না,

ক্রমে পারবে।" ওই বুঝতে না পারার অন্ধকার মুছিয়ে দিতেই যেন বিবেকানন্দ ওই চিঠিতেই মা সারদাকে 'জ্যান্ত দুর্গা' বলে বন্দনা করলেন। পরে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী পার্ষদদের মুখে শ্রীশ্রীমার মহিমা প্রকাশিত হয়েছে বহুভাবে। ভগিনী নিবেদিতাও শ্রীশ্রীমাকে দর্শনের অভিজ্ঞতাকে তাঁর অসামান্য মনন, মেধা, পাশ্চাত্য যুক্তি-বুদ্ধি পরম্পরা ও উদার মনোভাবের দ্বারা বিচার, বিশ্লেষণ ও গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। তাঁর সেইসব অভিজ্ঞতা, গভীরতা-নিবিড়তায় যে-আলোকসামান্য প্রাপ্তির তৃপ্ত সুরমূর্ছনা তুলেছিল তাঁর অনুভবলোকে, তা-ই তাঁর চিঠিপত্রে প্রকাশিত হয়েছে বারবার।

শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বজনস্বীকৃত জীবনীগ্রন্থ স্বামী সারদানন্দ লিখিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' প্রথম প্রকাশিত হয় ফাল্গুন ১৩২১ বঙ্গাব্দে। এই গ্রন্থে লেখক শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে সারদা দেবীর উপস্থিতিকে গভীর ব্যঞ্জনায় ভাববহ করেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক মাতৃশক্তির আরাধনার গভীর তাৎপর্য ও তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু এখানে পূর্ণাঙ্গ জীবনের সামগ্রিকতা নিয়ে সারদা দেবীর জীবন প্রকাশিত হয়নি। তাঁর প্রয়াণ ৪ শ্রাবণ ১৩২৭ বঙ্গাব্দে (২১ জুলাই ১৯২০)। প্রয়াণের পর তাঁর জীবন ও বাণী নানাজনের স্মৃতিকথার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হতে শুরু করে। এসব স্মৃতির সংকলনগ্রন্থ 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'—যার প্রথম ভাগ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এইসব স্মৃতিকথার মাধ্যমে এমন প্রচুর তথ্য পরিবেশিত হয়েছিল যে, গ্রন্থটি তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ রচনার প্রয়োজনীয় উপাদান পরবর্তী কালকে জোগান দিয়েছে।

শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করেন ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, 'শ্রীশ্রীসারদাদেবী' নামে। বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮ ভাদ্র ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে। এরপর ইংরেজিতে পূর্ণাঙ্গ জীবনী 'Sri Sarada Devi : The Holy Mother' প্রকাশিত হয় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মাদ্রাজ থেকে, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে। আলোচ্য সময়ের কিছু আগে-পরে রচিত আশুতোষ মিত্রের 'শ্রীমা', শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা', শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্তের 'শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমণি দেবী', লক্ষ্মীমণি দেবী ও যোগীন্দ্রমোহিনী বিশ্বাসের 'শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিকথা', দুর্গাপুরী দেবী লিখিত 'গৌরীমা', স্বামী গম্ভীরানন্দের 'শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা' প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীমায়ের জীবনের নানা ঘটনা প্রসঙ্গক্রমে বা এককভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

অচিন্ত্যকুমারের সাহিত্যজীবনের প্রেক্ষাপট

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের প্রাথমিক এবং সর্বাধিক পরিচয় সাহিত্যিক হিসাবে—ধর্ম বা অধ্যাত্মজীবনের মানুষ হিসাবে নয়; এবং অতি অবশ্যই তাঁর সাহিত্যযাত্রার প্রাথমিক পর্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে আছে 'কল্লোল' পত্রিকার নাম। 'কল্লোল' (প্রথম প্রকাশ ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে পালাবদল শুরু হয়েছিল—রবীন্দ্র-উত্তর নতুন পথ খোঁজার প্রয়াসের মধ্য দিয়ে। সূর্যসম রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে অনুকরণের ব্যর্থ প্রয়াস থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন এই সময়ের কবি-সাহিত্যিকরা। তাঁদের সেই সচেতনতাই অচিন্ত্যকুমারের কলমে ব্যক্ত হয়েছিল : ''সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্রঠাকুর,/ আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো/ যুগ-সূর্য ম্লান তার কাছে।"[১] স্বচোখের আলোয় ভিন্ন পথের সন্ধানে ব্রতী যুবক সাহিত্যিকরা প্রথমেই তাঁদের রচনায় বিষয়ের পরিবর্তন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। পরিবর্তিত বিষয়ের সন্ধানে তাঁরা নজর ফিরিয়েছিলেন সমকালের দিকে, নিজেদের ভাবনা-মেধাকে নিয়োজিত করেছিলেন সাহিত্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ বাস্তবতার সন্ধানে। অবশ্যই

মানুষের যে-জীবনকে তাঁরা দেখেছিলেন, খুঁজেছিলেন, সেই জীবন সমকালের এবং সেই জীবন একটি বিপর্যস্ত সমকালের আলোড়নে দুলতে দুলতে এগিয়ে চলেছিল। জীবনের সেই বিপর্যস্ততার প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছিল নিম্নরূপে—

এক, বিংশ শতাব্দীতে প্রথম সবথেকে বড় বিপর্যয় নিয়ে এসেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এর পরবর্তী সময়ে আধুনিক কবিদের যাত্রার শুরু এবং প্রতিনিধি-স্থানীয় সাহিত্যিকদের যাত্রার সমাপ্তি মোটামুটি বিংশ শতাব্দীর শেষ অর্ধের শুরুর প্রথম দুই শতকের মধ্যে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সভ্যতায় আমূল পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। অতীতের নিরুদ্বেগ জীবন, আত্মতৃপ্তি, মূল্যবোধ, ঈশ্বরবিশ্বাস, প্রকৃতি ও জীবনের নানা সৌন্দর্য প্রভৃতি বিষয়গুলি বিপ্রতীপ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধে বাঙালি সরাসরি অংশগ্রহণ না করলেও বারুদের গন্ধ সেও পেয়েছিল। সেই গন্ধেই বাঙালি সাহিত্যিকরা তিক্ত ক্ষোভে বিষোদ্‌গার করেছিলেন বিশ্বযুদ্ধের বিরুদ্ধে।

দুই, এইসময় ফ্রয়েড-ইয়ুং-এর গবেষণালব্ধ মানবমনের অজ্ঞাতলোকের আবিষ্কার সমগ্র বিশ্বে প্রবল আলোড়ন ফেলে দেয়। এই আবিষ্কার দাবি করেছিল, ব্যক্তি মানুষের চেতনার অন্তরালবর্তী অবচেতনাই নাকি অনেক বেশি প্রভাবশালী, সুতরাং কৌতূহলের। সেই অবচেতনার দুর্দমনীয় প্রভাবে মানুষের প্রবৃত্তি আত্মপ্রকাশ করে। ফ্রয়েড মানুষের মনের তিনটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান দিয়েছিলেন : Ego, Id, Super Ego। এতে প্রমাণিত হল মানুষের জৈবপ্রবৃত্তির অনিবার্য দাসত্ব। নারী-পুরুষের বিশ্বাসের সম্পর্ক, মা-সন্তানের অপাপবিদ্ধ সম্পর্ক প্রভৃতি চিরন্তন সম্পর্কগুলিকে বিকৃতভাবে দেখা শুরু হল। ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব সমাজকাঠামোকে ভাঙবার চেষ্টা করল। এরপর মানুষের জৈবপ্রবৃত্তির প্রতিক্রিয়া দেখানোর তাগিদ বিশ্বসাহিত্যেও দেখা গেল। সাহিত্যিকদের কাছে নীতি-দুর্নীতির প্রশ্নটি প্রায় মুছে গেল। বাংলা সাহিত্যও এর বাইরে থাকল না।

তিন, ফ্রেজারের মতো নৃতাত্ত্বিক; নিলস বোর, আইনস্টাইনের মতো পদার্থবিজ্ঞানীদের নতুন নতুন আবিষ্কার রহস্যময় চরাচরের ধারণাটিকে আরও বেশি অস্পষ্ট, জটিল করে দিল। মানুষের অনিশ্চিত জীবনের পরিচয় যেন অনিশ্চয়তাকে আরও প্রকট করে তুলল। এই অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তির কোনও পথ আছে কি না এই প্রশ্ন উঠে আসতে শুরু করল বটে, কিন্তু উত্তর পাওয়া হয়ে উঠল দুষ্কর। সাহিত্যে তার প্রকাশ ছিল স্বাভাবিক।

চার, বিংশ শতাব্দীতে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে শুরু হয়েছিল গণঅভ্যুত্থান। চিনে গণপ্রজাতন্ত্রী নায়ক হিসাবে সান-ইয়াৎ-সেনের অভ্যুত্থান, আয়ারল্যান্ডে কর্নেল কলিন্সের নেতৃত্বে সিনফিন আন্দোলন; ফ্যাসিবাদ-নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন—সবদিক থেকেই উত্তাল এই শতাব্দীর ঘটনাবলি সাহিত্যে গভীর ছাপ ফেলল।

পাঁচ, মার্কসীয় চিন্তার বিপ্লব দেখা দিল বিরাট রূপ নিয়ে। মেহনতি মানুষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিপ্লবের অঙ্গীকার নিয়ে হাজির হল এই মতবাদ। আর্থিক আর সামাজিকভাবে অতিরিক্ত ও বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত মুষ্টিমেয়দের সঙ্গে অবহেলিত, দরিদ্র, নিপীড়িত মানুষের অসমতা দূর করে দেওয়ার কথা প্রধান হয়ে উঠল। ফলশ্রুতিতে ভগবান ও প্রথাগত নীতিধর্মে অবিশ্বাস প্রবল হয়ে উঠল। সাহিত্যে এই অবিশ্বাস প্রকাশিত হল। চাষি-কুলি-মুটে-মজুরদের অস্তিত্বের সংকট আর সেই সংকটমুক্তির সম্ভাব্য স্বপ্নসন্ধান বা নিশ্চয়তাধ্বনি সাহিত্যে ভিন্ন সুরের জন্ম দিল।

ছয়, বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। তার ফলে গড়ে উঠেছিল নগর-জীবন, যে-জীবন যন্ত্রনির্ভর এবং ভোগমুখী। নগরকেন্দ্রিক সেই যান্ত্রিক, ভোগমুখী সভ্যতার

অভিঘাতে মানুষের জীবনে বাসা বাঁধতে শুরু করেছিল ক্লান্তি, নৈরাশ্য, আত্মবিরোধ, জিজ্ঞাসা, বিতৃষ্ণা, শিকড়ছেঁড়া নানা মনোবৃত্তি ইত্যাদি নেতিবাচক মনোভাব। সেই মনোভাব সাহিত্যের মধ্যেও রূপ পেল।

এইসব বৈশিষ্ট্যের মধ্য থেকে একথা পরিষ্কার বোঝা যায়, মানুষের জীবনে উপরিউক্ত নানা বিষয়ের ঘাত-প্রতিঘাত-অভিঘাতে তৈরি হয়েছে সংশয়, অবিশ্বাসের মতো নেতিবাচক প্রবণতা। যাবতীয় বৈষম্যের বিরুদ্ধে নানা পথে, নানা মতে মানুষের স্বপ্নসন্ধান সত্যই কোনও সাম্য এনে দিয়েছে কি না পরবর্তী কাল তার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মানুষের সংশয়, অবিশ্বাস, ভোগক্লান্তি, নৈরাশ্য, একাকিত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। অচিন্ত্যকুমার তাঁর কালের উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিনতেন। তাঁর রচিত সাহিত্যে সমকালীন জীবনের ওইসব বৈশিষ্ট্য নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। নিজের মোটামুটি পঞ্চাশ বছর বয়সের কাছাকাছি এসে তিনি রচনা করতে শুরু করলেন ধর্মীয় গ্রন্থ, নানা মহাপুরুষের জীবনী। 'পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি' সেইসব জীবনীগ্রন্থেরই একটি।

'পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি'

গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৬০ বঙ্গাব্দে। মনে রাখতে হবে, অচিন্ত্যকুমার যখন মা সারদার জীবনী লিখছেন তখন পূর্বোক্ত চিঠি, স্মৃতিকথা, জীবনীগ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়ে গেছে; এবং বিবেকানন্দ যে মন্তব্য করেছিলেন তাঁর 'জ্যান্ত দুর্গা'কে পরবর্তী কাল ক্রমশ চিনতে পারবে, সেই চিনতে পারার অধ্যায়টি উক্ত লেখাগুলির মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে গেছে। অচিন্ত্যকুমার তাঁর রচিত গ্রন্থের শেষে, তাঁর রচনার পূর্বে প্রকাশিত গ্রন্থগুলির ঋণ স্বীকার করে একটি তালিকা দিয়েছেন। যেহেতু প্রকাশিত তাই তিনি তাঁর গ্রন্থে শ্রীমা সারদার জীবনের তথ্যবহুল এবং ক্রমিক ঘটনাপরম্পরা তুলে আনার দিকে গুরুত্ব দিলেন না। বরং তিনি রচনা করলেন শ্রীমার একটি ভাবজীবন যা লেখকের নিজস্ব অনুভবের আলোকে পরিবেশিত ও ব্যাখ্যাত হল। স্মরণীয়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত একজন সাহিত্যিক। পৃথিবীর মানুষ এবং মানুষের মন নিয়ে তাঁর প্রধান কাজ। মানুষের সমাজে, পরিবারে মানুষের সম্পর্কগুলি এবং সেই সম্পর্কের নানা দিক, অভিমুখ, পরিবর্তন, বিবর্তন ইত্যাদি নিয়ে তিনি চরিত্র নির্মাণ করেন উপন্যাসে গল্পে; সেই অনুভব ছন্দোবন্ধনে ধরেন কবিতায়। প্রচলিত সম্পর্কগুলির মধ্য থেকে যদি নিখাদ সম্পর্কের সবথেকে ভাল দৃষ্টান্তের খোঁজ করা হয়, তাহলে একবাক্যে স্বীকৃত হবে, সে-সম্পর্ক মা-সন্তানের সম্পর্ক। সেই সম্পর্ককে সাধনার দ্বারা বিকাশের সর্বোত্তম স্তরে উত্তীর্ণ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। অচিন্ত্যকুমার তাঁর গ্রন্থে সারদা দেবীর সেই সর্বোত্তম মাতৃত্বকে অনুধ্যান করেছেন যা এই মর্ত্যলোকের মধ্যেই অমর্ত্যলোকের বার্তাবাহী।

মা সারদার কথা লিখতে গিয়ে লেখক নিজের অনুভবকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে মায়ের জীবনকে নতুন কোনও ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে উপস্থিত করলেন না। তিনি যে-জীবনী লিখলেন সেখানে কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে রইলেন শ্রীশ্রীমা; লেখক সেই চরিত্রকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত একটি মাতৃদর্শনকে প্রধান করে তুললেন—এটি আসলে হয়ে উঠল লেখকের মাতৃ-অনুধ্যান। তাই অচিন্ত্যকুমারের রচনাটিকে Hagiography বা সন্তজীবনী বলা চলে না; কারণ সন্তজীবনীর মধ্যে সাল-তারিখ-সময়-নির্দিষ্ট যে ঘটনাপরম্পরা থাকে তা অচিন্ত্যকুমারের লেখায় নেই। শুধু তাই নয়, শ্রীমার জীবনের ঘটনা-পরম্পরাকে তিনি যেন ইচ্ছে করেই লঙ্ঘন

করেছেন। মায়ের জীবনের একটি প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে সমপ্রসঙ্গের এক বা একাধিক ঘটনাকে উপস্থাপন করেছেন যেগুলি ভিন্ন ভিন্ন কালের। এই কারণে কখনও কখনও প্রসঙ্গান্তরে একই ঘটনা একাধিকবারও ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যদিকে, লেখক প্রসঙ্গের শুরুতে বা শেষে নিজের অনুভব ভক্তি-বিনম্রচিত্তে পরিবেশন করেছেন তাঁর কলমের অসাধারণ বাঙ্ময়তায়।

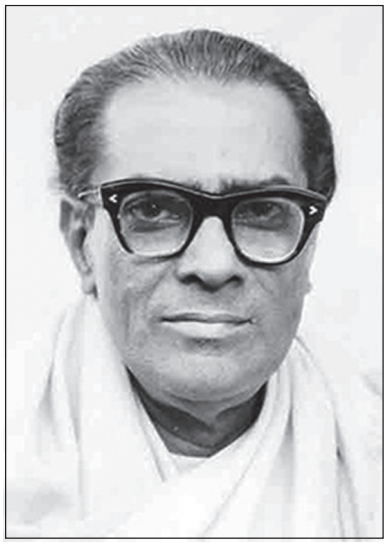

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

এইসব বৈশিষ্ট্য খেয়াল রাখলে আলোচ্য গ্রন্থটিকে জীবনী-উপন্যাস বলা যায়। অবশ্যই উপন্যাসের সব বৈশিষ্ট্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এখানে অনুসৃত হয়নি। বস্তুত প্রচলিত সাহিত্যের সংরূপের মধ্য থেকে যখন নতুন কোনও মিশ্র সংরূপ জন্ম নেয় কোনও লেখকের হাতে, তখন সেখানে প্রত্যেক পুরনো সংরূপের সব বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে না। এখানে তেমনটাই ঘটেছে।

আলোচ্য গ্রন্থে অচিন্ত্যকুমার নানা দিক থেকে মা সারদার জীবন ও বাণীর নানা বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত ও ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা সেগুলির মধ্যে প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্যকে বেছে নিয়ে আলোচনা করব; অন্যদিকে অচিন্ত্যকুমারকে তাঁর সমকালের প্রেক্ষিতে বোঝার চেষ্টা করব। শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণীর যে-তিনটি বৈশিষ্ট্য আমরা আলোচনা করব সেগুলি হল : এক, শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদার অভেদত্ব, দুই, মায়ের দৃষ্টিতে তাঁর সন্তানেরা এবং তিন, সন্তানের দৃষ্টিতে মা।

প্রথমত, শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদার অভেদত্ব : অচিন্ত্যকুমার গ্রন্থ শুরু করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং সারদা দেবীর বিবাহ প্রসঙ্গ দিয়ে। স্বরূপত শক্তি ও শিব বিবাহের মধ্য দিয়ে মিলিত হয়েছেন কীভাবে সেই প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন লেখক, কিন্তু আসলে এ-ঘটনা আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু এই কারণেই যে, এই বৈবাহিক সম্পর্ক মা-সন্তানের সম্পর্কের তুরীয় মাত্রাকে প্রকাশ করেছে। ভারতবর্ষে সাধনার বস্তু হয়েছে রাধাকৃষ্ণের অপার্থিব প্রেমলীলা, ভারত দেখেছে সর্বত্যাগী শিবের জন্য পার্বতীর তপস্যা। সেইসব অলৌকিক প্রেমগাথা ভারতসত্তার অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। এবার শ্রীরামকৃষ্ণ দেখালেন মাতৃমহিমা। ফলহারিণী কালীপূজার রাতে স্ত্রীকে ষোড়শীরূপে পূজা করলেন তিনি। এই পূজায় তাঁর সকল পূজা সাঙ্গ হল। আর এই পূজার মধ্য দিয়ে মাতৃশক্তিকে শ্রীমা সারদার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন তিনি। এই মাতৃশক্তি এবার সমস্ত পুরাণ-প্রতিমাকে ছাপিয়ে জগতকে মাতৃভাবের প্লাবনে আশ্রয় দেবে। আমাদের দেশ বৈরাগ্য কম দেখেনি। দেখেছে সর্বত্যাগী বিরাটহৃদয় গৌতম বুদ্ধকে, দেখেছে প্রখর জ্ঞানী শংকরের গৈরিক শ্রী, দেখেছে অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী চৈতন্যদেবের নিত্যনির্ঝরিত প্রেমাশ্রু। দেখেছে তাঁদের জীবনে কীভাবে নারী বর্জিত হয়েছে। এবার কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ‘ভবনেশ্বরীর মধ্যে ভুবনেশ্বরীকে’ দেখলেন।[২] স্বামী-সন্দর্শনের জন্য পিতৃগৃহ থেকে দুর্গম বিরাট মাঠ পেরিয়ে দক্ষিণেশ্বরে মায়ের যাত্রাকে, অচিন্ত্যকুমার রাধার অভিসারের সঙ্গে তুলনা করে দেখালেন। কিন্তু সেই অভিসারের শেষে এবার দাঁড়িয়ে আছেন যে-প্রেমাস্পদ তিনি ‘মধুর প্রেমলীলা’ নয়—প্রতিষ্ঠা

করবেন মধুর মাতৃলীলা। ভারতের পুরাণ, ইতিহাস মন্থন করে অচিন্ত্যকুমার এই ব্যতিক্রমী নতুনত্বকে প্রশ্নমালায় ধরলেন : ''স্ত্রীকে নিয়ে এমন দিব্য সাধনা আর কার? সমস্ত সাধনাকে কে স্ত্রীতে সারভূতা করেছে? মন্ত্রকে কে দিয়েছে মূর্তি? প্রার্থনাকে নিয়ে এসেছে শরীরীপ্রতিমায়?''[৩]

এখানে প্রশ্ন, শ্রীশ্রীমার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ যে-মাতৃত্বকে আবাহন করলেন ষোড়শীপূজার মধ্য দিয়ে বাস্তবের মাটিতে, সেই মাতৃত্ব অর্জনের জন্য কি কোনও তপস্যা করেছিলেন মা সারদা নিজে? শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের জীবনকালেই সারদা দেবীকে কঠিন তপস্যার মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, বারবার পরীক্ষা করে দেখেছিলেন তাঁর মাতৃত্বের গভীরতাকে। অচিন্ত্যকুমার তাঁর গ্রন্থের শেষে মন্তব্য করেছেন, দক্ষিণেশ্বরে শুধু শ্রীরামকৃষ্ণই তপস্যা করেননি, শ্রীমাও করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মতো শ্রীসারদার তপস্যাতেও দক্ষিণেশ্বর সিদ্ধতীর্থ। সর্বজীবে মাতৃত্বের বিরাট পক্ষপুট বিস্তারের জন্য প্রয়োজন ছিল সম্পূর্ণ আত্মবিলুপ্তি। কেবল নিজের সন্তান ধারণ না করেই নয়, শ্রীরামকৃষ্ণকে অদর্শনের মধ্য দিয়েও সেই আত্মবিলুপ্তির সাধনা শ্রীশ্রীমা করে গেছেন। তাঁর সমস্ত সত্তা জুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ, সেই তাঁকেই তিনি নহবতে থাকার সময় দিনের পর দিন ক্ষণিক-দর্শনও করতে পারেননি। নিজের মনকে বুঝিয়েছেন, ''মন তুই কি এত ভাগ্য করেছিস যে রোজ তাঁর দেখা পাবি?''[৪] এই আত্মবিলুপ্তির সাধনাকে অচিন্ত্যকুমার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। পরবর্তী কালে মা বলবেন, যখনই মনকে নির্বাসনা করতে পারা যায় তখনই ঈশ্বরদর্শন হয়। অচিন্ত্যকুমার দেখলেন, মায়ের নহবতের ঘরে আত্মবিলুপ্তি যেন সীতার মতোই নির্বাসন কিন্তু 'সারদার নির্বাসনটিই নির্বাসনা।'[৫] এই আত্মবিলুপ্তির তপস্যাতে কোনও দুঃখ নেই, আছে একটি অম্লান সন্তোষ, এই সন্তোষেই শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর নিত্যযোগ।[৬] নেই দীর্ঘশ্বাস, নেই দোষারোপ, আছে কেবল, 'একটি অমৃত উচ্ছল পূর্ণঘটের শান্তি।'[৭] এই যে পূর্ণত্বের শান্তি তা দর্শন-অদর্শনের ঊর্ধ্বে উঠে সর্বকাজে, সর্বজীবে, সর্বত্র শ্রীরামকৃষ্ণের অস্তিত্ব অনুভবে সমাপ্তি পেয়েছে। সেই সমাপ্তিতে কেবল 'রামকৃষ্ণ' নামক একটি শরীর নয়। সর্বশরীরে, সবখানে তাঁকে দর্শন করেছেন মা, আর তাতেই একটি অভেদজ্ঞান বিরাজ করেছে অনুক্ষণ। এদিক থেকে মায়ের চোখে শ্রীরামকৃষ্ণ আর এই জগৎ অভেদ; আর এই অভেদসূত্রেই রামকৃষ্ণ-সারদা-জগৎসংসার অভেদ, অদ্বৈত। শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পাননি বলে একদিন মা ভাগ্যের দোহাই দিয়ে নিজের মনকে বুঝিয়েছিলেন কিন্তু পরিণত অনুভবে সেই তিনিই বলছেন, ''একবার দেখি কী, জানো? দেখি, ঠাকুর সব হয়ে রয়েছেন। যেদিকে তাকাই সেইদিকে ঠাকুর। কানাও ঠাকুর, খোঁড়াও ঠাকুর, চাষাও ঠাকুর, মুটেও ঠাকুর—ঠাকুর ছাড়া আর কেউ নেই। বুঝলুম, তাঁরই ছিষ্টি, তিনি সব হয়ে আছেন। জীব কষ্ট পাচ্ছে না, তিনি কষ্ট পাচ্ছেন। তাই তো যদি কেউ এসে কেঁদে পড়ে, মনে হয় তাঁরই কান্না। তাই তো উদ্ধার করতে হয়। আমার কি! আমিও তিনি। তাঁর জিনিসে তাঁকেই তুষি।''[৮]

তাঁকে সর্বভূতে পাবেন বলেই পঞ্চতপা যজ্ঞে নির্ভয়ে প্রবেশ করেন মা, অগ্নিতে ঠাকুরের স্পর্শ কেমন বুঝতে হবে যে তাঁকে![৯] এই আশ্চর্য অভেদজ্ঞানেই মায়ের কাছে সন্ন্যাসি-সন্তান শরৎ আর ডাকাত আমজাদ অভেদ,[১০] মাতাল পদ্মবিনোদের মাতলামিকে অগ্রাহ্য করে সন্তানের আকুলতাটুকু তিনি শোনেন পরম মমতায়।[১১] শুধু মানুষ নয়, মনুষ্যেতর জীবেও তাঁর মাতৃমমতা প্রসারিত। পাখি গঙ্গারামকে মা পূজার আগে নৈবেদ্য থেকে মোহনভোগ তুলে খাওয়ান ওর মধ্যেও ঠাকুর আছেন দর্শন করে।[১২] এইসব বহুবিধ দৃষ্টান্ত জুড়লে যা হয়, সেটাই তো মায়ের জীবন। সেই

অভেদদৃষ্টিময়, অদ্বৈতজ্ঞানে অধিষ্ঠিত মায়ের জীবন অনবদ্য সাহিত্যসুষমায় অচিন্ত্যকুমার বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয়ত, মায়ের দৃষ্টিতে তাঁর সন্তানেরা : মা সারদা শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছামূর্তি। শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছায় বিধৃত আছে সর্বব্যাপ্ত মাতৃত্বের শেষকথা। আমরা সংসারে সাধারণ যে-মাতৃমহিমার সঙ্গে পরিচিত তা মহৎ কিন্তু শ্রীমা সারদার মধ্যে প্রকাশিত মাতৃমহিমা অন্যরকমের। সুন্দরভাবে এই তফাতটি লিখলেন অচিন্ত্যকুমার : শ্রীমা সারদার মা শ্যামাসুন্দরী আক্ষেপ করেছিলেন এই বলে যে, সারদার কোনও ছেলেপুলে হল না। অচিন্ত্যকুমার সন্তানের আবদারের মতো করে লিখলেন, ''ভাগ্যিস হয়নি! হলে কি আর আমাদের মা হতেন? বিমাতা হয়ে যেতেন। হতেন বা পাতানো মা। কেঁদে উঠলে তক্ষুনি-তক্ষুনি শুনতেন না, দেরি করে ফেলতেন। পক্ষপাতী হতেন। নিজের পেটের ছেলেকে শাঁস দিয়ে আমাদের দিতেন খোসাভূষি। টাটকা দুধটুকু দিয়ে আমাদের দিতেন জল-মেশানি দুধ।"[১৩] সংসারের সাধারণ মায়ের নিজের সন্তানের প্রতি যতটা মমতা-স্নেহ-ভালবাসা-আন্তরিক টান থাকে, অন্যের ছেলের প্রতি ততটা থাকে না। কিন্তু শ্রীশ্রীমার মাতৃত্ব কেবল নাড়িছেঁড়া আদরের ধনে সীমাবদ্ধ নয়, সর্বজীবে প্রসারিত। এ-মাতৃত্বে কোনও ভেদজ্ঞান নেই, নেই দূরত্ব, আপনত্বের অভাব। এমনকী মাতৃত্বের প্রশ্নে, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে এক ও একমাত্র 'এইখানেই যা একটু সংঘাত'।[১৪] তাঁর নিষেধ সত্ত্বেও মা, কলঙ্কিত পূর্বজীবন নিয়ে আসা মেয়েকেও ত্যাগ করতে নারাজ।[১৫] সাধক অল্পবয়সী বাবুরামকে বেশি রুটি খেতে শ্রীরামকৃষ্ণ নিষেধ করলে, স্বামীর কথার প্রতিবাদ করেন সারদা, অভয়বাণী শোনান, ''ছেলেদের ভাবনা আমি ভাবব, আমাকে ভাবতে দাও।"[১৬] এই সংঘাতই আসলে তপস্যা, শ্রীরামকৃষ্ণের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার অভিজ্ঞান। তাই তো শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীসারদার মাতৃত্বের পরিপূর্ণ বিকাশরূপটি দেখে হার মেনে তৃপ্ত হলেন, ''এই হারেই মেনে নিলেন মা'র মাতৃত্বের গভীরতা।"[১৭]

তৃতীয়ত, সন্তানের দৃষ্টিতে মা : মা সন্তানদের সর্বদা অভয়বাণী শোনাচ্ছেন বটে কিন্তু সেই অভয়বাণী শোনার মতো কান তো দরকার! মা যেমন অপার মমতায় সন্তানকে আঁকড়ে ধরেন তেমন সন্তানও কি মায়ের কোলের গভীর আশ্রয়কে আঁকড়ে ধরে না? পৃথিবীর বুকে সর্বজীবের মধ্যে মায়ের কোলে আশ্রয়ের এই স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যটি সহজলভ্য। প্রশ্ন হল, ওই সহজলভ্যতাকে সাধনলভ্যতায় যদি উত্তীর্ণ করে দেওয়া যায়, তাহলে সেই সাধনলভ্য মাতৃপ্রেম জীবনের কোনও মহত্তম প্রাপ্তিকে কি অনায়াসলভ্য করে তুলতে পারে? এ-প্রশ্ন সন্তানের হতে পারে, সাধকের হতে পারে, সমাজের-মানবসভ্যতার হতে পারে, সতের-অসতের হতে পারে, এ-প্রশ্ন যে-কারও হতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তরের সন্ধান অচিন্ত্যকুমার দিয়েছেন, যখন সন্তানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মায়ের জীবনকে দেখেছেন। এক্ষেত্রে মায়ের বাণী শুধু নয়, মায়ের জীবনই সন্তানের কাছে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর হয়ে হাজির হয়েছে। শ্রীমা সারদা লজ্জাশীলা ভারতীয় নারী, ক্ষমামূর্তিতে তিনি অনন্যা, সর্বজীবে দয়ায় তিনি দ্রবীভূতা, বুদ্ধিতে-বাস্তববোধে অদ্বিতীয়া, সারল্যের প্রতিমূর্তি, সহ্যগুণে দৃষ্টান্তরহিত, নির্বাসনায় অপ্রাকৃত। এই প্রত্যেকটি গুণই সন্তানের কাছে তার নিজের জীবনগঠনের ক্ষেত্রে অবলম্বনস্বরূপ; প্রত্যেকটিই তাই আলাদা করে আলোচনার যোগ্য। আমরা কেবল এগুলির মধ্য থেকে দু-একটি বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করে, সন্তানের দৃষ্টিভঙ্গিতে মাতৃদর্শন যেভাবে করিয়েছেন অচিন্ত্যকুমার, তা বোঝার চেষ্টা করব।

অচিন্ত্যকুমার লিখছেন দুর্গাচরণের তথা

নাগমশাইয়ের অতুল্য ভক্তির কথা। শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্ত নাগমশাই বিশ্বাস-ব্যাকুলতা-শুদ্ধাভক্তির সেই মূর্তি যাঁর প্রতিটি আচরণ মায়ের জন্য আকুলতার ব্যতিক্রমী আখ্যান নির্মাণ করেছে। সেই আন্তরিক আকুলতায় মা ছুটে এসে নিজের হাতে তাঁর চোখের জল মুছিয়ে দিয়েছিলেন। এই ঘটনা বর্ণনা করে অচিন্ত্যকুমারের মন্তব্য : ''এই তো মা। সন্তান যখন ঠিক-ঠিক কাঁদে, কান্নার মধ্যে আকুলতার অগ্নিস্পর্শ লাগে, তখন এমনি করেই উঠে আসেন।''[১৮] এইরকম ব্যাকুলতার সঙ্গে আবার ভক্তভৈরব গিরিশের মধ্যে আছে মাকে পাওয়ার প্রচণ্ড জেদ। দুর্গাপুজোয় গিরিশ নিজের বাড়িতে দুর্গাপ্রতিমা এনেছেন কিন্তু জেদ, 'জ্যান্ত দুর্গা' না এলে তিনি পুজোই বন্ধ করে দেবেন। অসুস্থ মায়ের গিরিশের বাড়ি আসা অনিশ্চিত। কিন্তু ছেলের জেদের কাছে, আর্তির কাছে ধরা দিলেন মা; শারীরিক অসুস্থতাকে সরিয়ে রেখে এলেন গিরিশের বাড়ি। ''মা এসেছেন। দীন-হীন পাপী-তাপী নিঃস্ব-নিরালম্বের মা। সমস্ত বঞ্চনার মধ্যেও যাঁর অঞ্চলের আশ্রয়টুকু অটুট থাকে সেই মা। গৌরববহনে আসেননি, গোপনচরণে এসেছেন। ঐশ্বর্যের সদর দিয়ে আসেননি, এসেছেন মাধুর্যের খিড়কি দিয়ে। গিরিশের আনন্দ তখন দেখে কে।''[১৯]

সন্তানের এই আর্তি, আকুলতা, আন্তরিকতা, আত্মনিবেদনেই জোর দিয়েছেন অচিন্ত্যকুমার—বড় বড় কথা নয়, তত্ত্বের কাঠিন্য নয়, সাধনার গূঢ় ইঙ্গিত নয়। এমনকী মায়ের স্বরূপ জানার ইচ্ছাটাও যেন অতিরিক্ত। সবথেকে সহজে, সবথেকে সরলভাবে শ্রেষ্ঠ সম্পদ পাওয়ার পথটির কথা লিখলেন অচিন্ত্যকুমার মায়ের জবানিতে নিজের অনুভবে : ''আমি কে তা জেনে তোমার লাভ কি। দেখ তোমার অন্তরে একটি বেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল কি না। তাতে ধরল কি না অনুরাগের রং! লাগল কি না শরণাগতির সৌরভ। তা যদি হয়ে থাকে তবে তোমার সেই চিত্তকমলটিই পূজার পুষ্প। বীণাবাদিনীর পা রাখবার জায়গা।''[২০]

পড়তে পড়তে মনে হয়, অচিন্ত্যকুমার যেন একটি ছোটগল্পের কিছু অংশ লিখছেন, বাহুল্যবর্জিত অথচ একমুখী অথবা সাহিত্যিকের মনোলোকে সাহিত্যসৃজনের প্রকৌশলটির মতো করে সন্তানের হৃদয়ে মাতৃমমতা বিকাশের ধারাপথটি বর্ণনা করছেন। 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর' সাহিত্যের রসস্রষ্টা সাহিত্যিকের 'অপূর্বনির্মাণক্ষমপ্রজ্ঞা'র সঙ্গে সাধকের প্রজ্ঞা কি কোনওভাবে মিশে যায় তাহলে? *ক্রমশ*

তথ্যসূত্র

১। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোল যুগ* (এম সি সরকার এন্ড সনস প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা, ১৪০৯), পৃঃ ৮৪
২। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি* (সিগনেট প্রেস : কলকাতা, ২০১৮), পৃঃ ৩৪
৩। তদেব, পৃঃ ১৬
৪। তদেব, পৃঃ ১০৫
৫। তদেব, পৃঃ ৪২
৬। তদেব, পৃঃ ৬৮
৭। তদেব, পৃঃ ৯৩
৮। তদেব, পৃঃ ১২২
৯। তদেব, পৃঃ ১২৮
১০। তদেব, পৃঃ ৫৭-৬৩
১১। তদেব, পৃঃ ৬৩-৬৪
১২। তদেব, পৃঃ ৯৪
১৩। তদেব, পৃঃ ১৪
১৪। তদেব, পৃঃ ৮৬
১৫। তদেব, পৃঃ ৮৬
১৬। তদেব, পৃঃ ৮৯
১৭। তদেব, পৃঃ ৮৭
১৮। তদেব, পৃঃ ৩৯
১৯। তদেব, পৃঃ ১৪৬
২০। তদেব, পৃঃ ২১